বাঁশরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. mp. 4076
DATE 7/9/09
CALCUTTA

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

বাঁশরী

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

মূল্য—১॥০

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাঁশরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হোলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত-শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান্-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁৎ আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুষমা সেনদের বাগানে।)

বাঁশরী

ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত ল্যাজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতী বাঙালী মহল,

ফ্যাশনেবল্ পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়ীতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ

রোসো—একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন?

বাঁশরী

কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত ঊর্দ্ধে তুলবে যে, ইতর সাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ

আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরী

সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্চে না, তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যবসা চালাচ্চ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস

নেই পাছে মালের গুমর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ "বেমানান।" শস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ

কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ শার্ট্‌ফ্রন্ট্‌ ফুঁড়ে।

বাঁশরী

রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা মাখানো! ওতে যারা ভোলে তারা অজ্‌বুগ।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন?

বাঁশরী

তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষ্যা কর,

বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান ?

ক্ষিতীশ

আদালতের সাক্ষীর মতো জানিনে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরী

বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পূরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হোলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ

ছেলেমানুষী রুচিকে রস জোগাবার ব্যবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরী

বাস্‌রে! আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তাহোলে আস্তাকুঁড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেই সঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর

হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলিনে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ

অন্তত তোমাকে তো জেনেছি বাঁশি! কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরী

দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ

এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বুঝি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরী

তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার

গল্প পড়েছ। ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হোলো, দু-হাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ আমার লেখায় পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠক শিশুদের নাচাচ্চি।

বাঁশরী

বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই-পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ

সত্যের পরিচয় আছে তোমার ?

বাঁশরী

হাঁ আছে, দুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দুঃখের কথা—লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাচ্চা করে লিখতে শেখো। যাতে মনে হবে আমারি মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ

জানার কথা তো বল্‌লে, জানবার পদ্ধতিটা কী ?

বাঁশরী

পদ্ধতিটা সুরু হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তাহোলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্‌সিস্‌।

বাঁশরী

তবে শোনো—একপক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুষমা সেন। পুরুষমাত্রেরই মত এই যে, ওর যোগ্য-পাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ধত যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভঙ্গী দেখি যাতে বোঝা যায় আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোকক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশঙ্কর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দোঁহাকার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ

দু-জন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায় ?

বাঁশরী

আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরন্দর সন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুষমার মা বল্লেন—অনুষ্ঠানটা হোক ব্রাহ্মসমাজের কাউকে দিয়ে, সুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরন্দর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের ; বাদলা কোনো না কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টি-পাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্ আর নয়।

ক্ষিতীশ

ওই যাঃ, এই দেখো আমার এণ্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালীব দাগ।

বাঁশবী

ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালীর দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিষ্ট্, নির্ম্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা।

ক্ষিতীশ

তার মানে ?

বাঁশরী

ছুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ছুই সখীর প্রবেশ)

১

আজ সুষমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট, মনে করতে কেমন লাগে।

২

সব মেয়েরই এন্‌গেজ্‌মেণ্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১

কেন ?

২

মনে হয় দড়ির উপরে চলছে, থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে সুখ দুঃখের মাঝখানে। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১

তা সত্যি। আজ মনে হচ্চে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন্‌ উঠল। নায়ক নায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রঙ্গভূমিতে। রাজা সোমশঙ্করকে দেখলে মনে হয় টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো তিনশো বছর পেরিয়ে।

২

দেখিস্‌নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর। খাঁটি মধ্যযুগের ; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরীর হাতে, হোলো ওঁর মডার্ন্‌ সংস্করণ।

দেখতে দেখতে যে রকম রূপান্তর ঘটল, কারো সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরীর গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশঙ্কর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

১

বাঁশরীর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দর সন্ন্যাসী, সব ক-টা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আঙটি বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরীর।

(সুষমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ। স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যে রকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিল-বিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়েনি যৌবনের ধারাবশেষ।)

বিভাসিনী

বসে বসে কী ফিস্ ফিস্ করছিস্ তোরা ?

১

মাসি, লোকজন আসবার সময় হোলো, সুষমার দেখা নেই কেন ?

বিভাসিনী

কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্

বাছা চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১

যাচ্চি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্দুর।

বিভাসিনী

যাই দেখি গে সুষমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি?

২

না মাসি।

বিভাসিনী

কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল।

১

না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলুম।

(বিভাসিনীর প্রস্থান।)

২

চেয়ে দেখ্ ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপু বিশ্বাস মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল সুষমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১

নেপু বিশ্বেস! ওর মুখ বাঁকবে না? বুকের মধ্যে যে ধনুষ্টঙ্কার! আজকাল সুষমাকে নিয়ে ছেলেদের দলে বুক জ্বলুনির লঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লার ঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২

সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেল্‌লে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১

দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভরে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কষ্ট।

২

জানিসনে আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি। লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌষমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বল্‌ছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে আইন করে ধরে ধরে

অবিলম্বে সব ক-টার জীবন্ত সমাধি অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে বাত্তিরে ভদ্রলোকদেব ঘুম বন্ধ। পাব্লিক-ন্যুসেন্স যাকে বলে।

১

এই লোকহিতকর কার্য্যে তুই সাহায্য করতে পারবি প্রিয়।

২

দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের চেয়ে কম নয় ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘবে লক্ষ্মী স্থাপন করবার সখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বুঝতে পারি। অমু, ঐ লোকটাকে চিনিস?

১

কখনো তো দেখিনি।

২

ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরী দামী জিনিষের বাজার দর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে—ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্চি, মুক্তার বদলে শুক্তি।

১

চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদেব একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে। (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউবা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউবা খেলছে টেনিস্, কেউবা টেবিলে সাজানো আহার্য্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।)

শচীন

আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিল্‌পেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেণ্ট টেন্যান্সির দাবী করবে। উচ্ছেদ করতে ফৌজদারী।

তারক

কার কথা বলছ ?

শচীন

ঐ যে নববার্ত্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক

ওর লেখা একটাও পড়িনি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন

পড়নি ওর নূতন বই 'বেমানান' ? বিলিতি-মার্কা নব্য বাঙালিকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ

দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বুঝবে, নিংড়ে ধবধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তারপরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চ্চনা

ওর ছোঁওয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁওয়াকে। দেখছ না দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগুলোতে তা দিচ্চে।

সতীশ

ও হোলো সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে হাঁটা পেয়াদা. মিলন ঘটবে কী উপায়ে ?

শচীন

ঘট্‌কী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরী। হাই-ব্রৌ দার্জ্জিলিং আর ফিলিষ্টাইন্ সিলিগুড়ি এর মধ্যে উনি রেললাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরি চক্রান্তে।

সতীশ

তাই নাকি! তাহোলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা

তোমরা যা-ই বল,আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ

কোন গুণে?

শৈল

চেহারাতে। শুনেছি ছেলেবেলায় মায়ের বঁটির উপব পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁৎ নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমাব ভালো লাগে না।

শচীন

মিস্ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁৎ করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তাহোলে শত হস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল

আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ

শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বঁটি মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে একমহলে, ঠাঁই বদল করতে দেরি হয় না।

শচীন

তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল

আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে।

শচীন

সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল

রাগিয়ো না বলছি, তাহোলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন

জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ

মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্দ্ধা। গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে এক্সিডেন্ট্ অনিবার্য্য।

লীলা

মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ যে কী গানটা, "বলেছিল ধরা দেব না।"

গান

বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয়নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তারপরে শেষে কী যে হোলো কার,
কোন দশা হোলো জয় পতাকার,
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চ্চনা

আঃ কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনি কেঁদে ফেলবে। সুষীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন চা খেতে।

লীলা

হায়রে কপাল ! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই দেখতে পাও না !

সতীশ

কেন দেখবার কী আছে ?

লীলা

ঐ যে, এণ্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কালীর দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ

আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার।

লীলা

বোমা তদন্তে পুলিশ না এলে ওঁকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সতীশ

আমার কিন্তু ভয় হয়, কোনদিন বাঁশরী ঐ জখমি মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খুলে বসে।

লীলা

কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরীর জন্যে ভয় ! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙবে শুনে। আমি উপস্থিত ছিলুম।

Acc. 4076, dt. 7.9.09

শচীন

কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প! সুরু করো।

লীলা

সোমশঙ্কর হাত-ছাড়া হবার পরে বাঁশরীর সখ গেল নখী দন্তী গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটাল কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ একালে জন্মালে সে হোতো ঠিক তোমারি মতো শৈল। এদিকে জয়দেবের স্ত্রী ষোলো আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানা পুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি. ড্যাশ্ দিয়ে ফুট্‌কি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালীতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব্, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরী চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে

উঠল, "মাস্‌টর্‌পীস্‌!" ধন্যিমেয়ে! একেবারে সাব্লাইম্‌ ন্যাকামি!

শচীন

মানুষটা চুপ্‌সে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বোধ হয়।

লীলা

উল্টো। বুক উঠল ফুলে। বললে, "শ্রীমতি বাঁশরী, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনিত্র নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিইনে, তাকে কোদালই বলি।" বাঁশরী বলে উঠল, "তোমার খেতাব হওয়া উচিত—নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্ব্বিত।" ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতস বাজির মতো।

শচীন

এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা

একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য্য করেছি, এবার মুগ্ধ করে দেব। বললে, "শ্রীমতী বাঁশরী, আমার একটা থিয়োরী আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারীতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জ্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হোতো বন্ধ্যা।"

আমাদের সর্দ্দার নেকি শুনেই এতখানি চোখ করে বললে, "মাটিতে! বলেন কী ক্ষিতীশবাবু! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পঞ্চভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরণায়।" যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুটিয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো, হাঁপ ধরিয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্য্যন্ত।

শচীন

ক্ষিতীশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল বলো!

লীলা

সম্পূর্ণ! বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, "তুই তো এম্-এস্-সিতে বায়ো-কেমেষ্ট্রী নিয়েছিস, শুনলি তো? বিশ্বে রমণীর রমণীয়তা যে অংশে, সেইটাকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে হাইড্রলিক্ প্রেস্ দিয়ে দলিয়ে সল্‌ফ্যুরিক্ এসিড্ দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসর্চে লাগতে হবে।" দেখো একবার দুষ্টুমি, আমি কোনো

কালে বায়োকেমেষ্ট্রি নিইনি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্যে চাতুরী। তাই বলছি ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈবচ। সব শেষে বোকাটা বললে,"আজ স্পষ্ট বুঝলুম পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে, মাটির তলার বোবা ভাষাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে"। এত হেসেছি!

তারক

তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরী বলে উঠলেন, "দেখো লাহিড়ি, ওর মুখ দেখতে আমাব পজিটিভ্‌লি ভালো লাগে।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললেম, "তাহোলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডার্‌ন্‌ আর্ট্‌। বুঝতে ধাঁধাঁ লাগে।" ওব সঙ্গে কথায় কে পারবে—ও বললে, "বিধাতার তুলীতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।" বাই জোভ্‌, সূক্ষ্ম বটে।

শৈল

আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের? ক্ষিতীশ-বাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ

ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উল্টো-দিকে, শোনা যাবে না।

অর্চ্চনা

আচ্ছা তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস্ খেলতে যাও, ওই মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

(অর্চ্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুসি ঢল্‌ঢলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।)

অর্চ্চনা

ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বুঝতে পারি কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন দোষে? নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজেও কি তাই? আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে, সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ

দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে, আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু; ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চ্চনা

কী চমৎকার! আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলুম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাতজন্ম উপোষ করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝকঝকে কথাটা বেরোত না। তা যাকগে, পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্য্যন্ত ছাপাইনি। আমার নাম অর্চ্চনা সেন। ঐ যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বেড়াচ্চে আমি তারি অখ্যাত কাকী।

ক্ষিতীশ

এবার তাহোলে আমার পরিচয়টা—

অর্চ্চনা

বলেন কী! পাড়াগেঁয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ ষ্টেশনে কি গাইড্ রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে

যে কলকাতা সহরটা রাজধানী! এই পরশুদিন পড়েছি আপনার "বেমানান" গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর কি। ওকী! প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়? খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আচ্ছা সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ যে, যে-জায়গাটাতে মিস্‌টার্ কিষেণ গাপ্টা বি-এ ক্যান্টাব্, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙ্‌টি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাসীর দাবী করে হোহা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, ম্যাচ্‌লেস্,—বঙ্গ-সাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়া কাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিস্‌টিক্ ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ

আমাদের দু-জনের মধ্যে কে বেশি ভয়ঙ্কর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চ্চনা

না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে

ফেলুন। আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোষ্ট্ ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমন সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী তার নাম—কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে,মাই আইজ্, ও গড্—লাজুক ছেলে স্যাণ্ডেলের সঙ্কোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মৎলব ছিল স্যাণ্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হ'বি তো হ' স্যাণ্ডেলের হাতে হোলো কম্প-উণ্ড ফ্র্যাক্চার্। কী ড্রামাটিক্, রিয়ালিজমেব চূড়ান্ত। ভালোবাসার এত বড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জ্জুনেরও কব্জি গেল বেঁচে।

ক্ষিতীশ

কম মডার্ন্ নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চ্চনা

দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলম-টার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা

(কিছু দূর থেকে) অর্চ্চনা মাসি, সময় হয়ে এল ডাক পড়েছে।

অর্চ্চনা

(জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

(অর্চ্চনার প্রস্থান।)

(লীলা সাহিত্যে ফার্ষ্ট্ ক্লাশ্ এম্-এ ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স্ ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা তামাসায় তীক্ষ্ণ—সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।)

লীলা

ক্ষিতীশবাবু নমস্কার! আপনি 'সর্ব্বত্র পূজ্যতে'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারী আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম! কী লিখলেন দেখি?

"অন্য সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।" চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক্। মারে ঈর্ষা করে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইডিয়ম্ ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ

বাগ্বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য্য করে দিলেন।

লীলা

বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন্। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্য-রচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্য প্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইএর পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট্। ঐ যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আরেক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে, স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য্য সাইকলজির ধাঁধাঁ। বোঝা শক্ত স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী, না, তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য্য।

ক্ষিতীশ

না না আপনি ওটা—

লীলা

বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল্ আইডিয়া,

এমন ঝকঝকে ভাষা, এমন চরিত্রচিত্র আপনার আর কোনো লেখায় দেখিনি। আপনার নিজের রচনাকেও বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষ-গুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ

ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'—ও বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা

বলেন কী! ছি, ছি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার একী বুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্চি—রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

(লীলার প্রস্থান।)

(রাজা বাহাদুর সোমশঙ্করের প্রবেশ। রাঘুবংশিক চেহারা "শালপ্রাংশু মহাভুজঃ" রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারী মুখ দাড়ি গোঁফ কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচ্‌কান, সাদা মস্‌লিনের পাঞ্জাবী কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরা জুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।)

সোমশঙ্কর

ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি?

ক্ষিতীশ

নিশ্চয়।

সোমশঙ্কর

আমার নাম সোমশঙ্কর সিং। আপনার নাম শুনেছি মিস্ বাঁশরীর কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ

বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিঁধে।

সোমশঙ্কর

আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাইনি। তবু আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম। কোনো এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরী

(পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ শঙ্কর, যা চোখে

দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উল্টো দিকে। সে কথা যাক। **শঙ্কর** ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্চি সেটা আমার গ্রহের ভুল নয় গৃহকর্ত্তা-দেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সুষমার সঙ্গে তোমার এন্‌গেজ্‌মেণ্টের দিন অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হোতেই পারে না। খুসী হওনি অনাহূত এসেছি বলে?

সোমশঙ্কর

খুব খুসী হয়েছি, সে কি বলতে হবে?

বাঁশরী

সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপা গাছটার তলায় কিছুক্ষণ অদ্বিতীয় হয়ে থাকোগে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না।

(ক্ষিতীশের প্রস্থান।)

শঙ্কর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনি ছুটি দেব। তোমার নূতন এন্‌গেজ্‌মেণ্টের রাস্তায়

পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

(বাঁশরী রেশমের থলি থেকে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেস্‌লেট্‌, মুক্তোবসানো ব্রোচ্‌ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পূরে সোমশঙ্করের কোলে ফেলে দিলে।)

সোমশঙ্কর

বাঁশি, তুমি জান আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশরী

সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হোলো।

সোমশঙ্কর

যেয়ো না বাঁশি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। সহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরী

আমার শেষ কথাটা শোনো শঙ্কর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন জাগা অরুণ রঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে, তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্ম-পবিচয় ঘটল। বাস্, ছুইপক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন ছু-জনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশঙ্কব

বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্ব্বোধের মতো বলব। বুঝলুম আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনো-দিনই। আচ্ছা তবে থাক্। অমন চুপ কবে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন? মনে হচ্চে তুই চোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত কবে দেবে।

বাঁশবী

আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পবেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকেব দিনেব অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপব দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধূলো হয়ে যাবে, সেই ধূলোব উপরে ব'সে খেলা কববে

তোমার নাতি নাৎনীরা। সেই নির্ব্বিকার ধূলোর হোক জয়।

সোমশঙ্কর

এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে। (ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে।)

(সুষমাব বোন সুষীমার প্রবেশ। ফ্রকৃপবা, চষমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে-চলা এগাবো বছবেব মেয়ে।)

সুষীমা

সন্ন্যাসী-বাবা আসছেন শঙ্করদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না বাঁশিদিদি ?

বাঁশরী

আসব বৈ কি, আসার সময় হোক আগে। (সোমশঙ্কর ও সুষীমার প্রস্থান) ক্ষিতীশ, শুনে যাও: চোখ আছে ? দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ?

ক্ষিতীশ

রঙ্গভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছিনে।

বাঁশরী

বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছ

নিজের জোরে, আলকাৎরা ঢেলে। এখানে পুতুল-নাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারো অফীশিয়াল্ গাইড্ চাই! লোকে হাসবে যে!

ক্ষিতীশ

হাস্থক না। রাস্তা না পাই, অমন গাইড্‌কে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরী

রসিকতা! সস্তা মিষ্টান্নের ব্যবসা! এজন্যে ডাকিনি তোমাকে! সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারিদিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ

নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী?

বাঁশরী

নিজে লিখতে পারি নে যে ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি করা মালে কাজ

চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলম-হারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

(সুষমার প্রবেশ। দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রং যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।)

সুষমা

(ক্ষিতীশকে নমস্কার করে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন ?

বাঁশরী

কুণো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শাণে চড়িয়ে তার চেক্‌নাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরৎকে দামী করে তোলে জহরী, পরের ভোগেরই জন্য, কী বলো ? সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুষমা

জানি বৈ কি। এই সেদিন পড়ছিলুম ওঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য এতই কি ভালো !

সুষমা

ও রকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরী আর ঐ আমার পিস্‌তুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিছে বুদ্ধির। অনেক কথা বুঝতেই পারিনে। বাঁশরীর কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হোলে বুঝিয়ে নেব।

বাঁশরী

ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্‌ হিষ্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রং লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানী সমুদ্রেব ওপার থেকে। দেখে দয়া হোলো। বললুম জীব জন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহা গহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয় অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী ?

সুষমা

তাই বুঝি এনেছ এখানে ?

বাঁশরী

পাপমুখে বলব কী করে? তাই তো বটে! ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মাল মশলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজুরগিরি করছি।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ওদিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভি-শাপ কুড়োচ্ছ?

বাঁশরী

(উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়-যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ওদিকে।

(সুষমার প্রস্থান।)

ক্ষিতীশ

কী আশ্চর্য্য ওঁকে দেখতে! বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড্।

বাঁশরী

(তীব্রহাস্যে) হায়রে হায় যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্ব্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্‌ট্ বলে দেমাক কর, ভাণ কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্ব্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ

সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষ জাত দুর্ব্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়লিস্‌ট্! রিয়লিস্‌ট্ মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই

জানি তোমাদের। পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্ বানাইনে। রং মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্ত্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে, এথীনা মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্ত্র পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরী

সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ

এর উপায় ?

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোসটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্চে। সামনে পড়ল পথ-চল্‌তি এক রাজা, সুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে ? টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিষটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ

টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেই সঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরী

আছে গো হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা একদিকে, হৃদয়টা আর একদিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনি জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হোলো,

অর্থাৎ তাদের মন্ত্র-শক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্চে। উঁচু দরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রং চটিয়ে দেওয়া! সর্ব্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রং যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিঁকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ

শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্ত্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি?

বাঁশরী

ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস্ খেলা সেরে এসেছে। এখন আইস্‌ক্রীম্ পরিবেষণের পালা। বঞ্চিত হবে কেন?

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বাগানেব একদিক। খাবাব-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, সুধাংশু, সতীশ ইত্যাদি)

তারক

বাড়াবাড়ি হচ্চে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পুবন্দর নয় সবাই জানে। আসল নাম ধবা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মত-ভেদ। ধর্ম্ম কী জিজ্ঞাসা কবলে হেসে বলে, ধর্ম্মটা এখনো মবেনি তাই তাকে নামেব কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি আমাদেব হিমুকে গল্‌ফ্ শেখাচ্চে। হিমুর জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্‌ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পাবে, তাব বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্‌গদ। মিস্‌টীরিয়স্ সাজের নানা মাল-মশলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি এক্‌স্‌পোজ্ করব সবার সামনে, দেখে নিও।

সুধাংশু

প্রমাণ করবে তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো।

সতীশ

আঃ সুধাংশু, মজাটা মাটি করিস কেন? পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডকুমেণ্ট্ আছে। বের করুক না, দেখি কী রকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

(পুরন্দরের প্রবেশ। ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রং পাণ্ডুর শ্যাম, অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাঁড়ি গোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধুতি পরা, গায়ে খয়েরি রঙের ঢিলে জামা। সঙ্গে সুষমা, সোমশঙ্কর, বিভাসিনী।)

শচীন

সন্ন্যাসী ঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী?

পুরন্দর

কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন

নেমন্তন্ন আপনাকেও ? লাঞ্চে না কি ? গ্রেট্-ইষ্টার্নে বোষ্টমের মোচ্ছব ?

পুরন্দর

গ্রেট্ইষ্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্-কক্সের ওখানে।

শচীন

ডাক্তার উইল্কক্স্! কী উপলক্ষ্যে ?

পুরন্দর

যোগ-বাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন

বাস্‌রে! ওহে তারক, এগিয়ে এসো না।—কী যে বলছিলে ?

তারক

এই ফোটোগ্রাফ্‌টা তো আপনার ?

পুরন্দর

সন্দেহ মাত্র নেই।

তারক

মোগলাই সাজ, সামনে গুড়গুড়ি, পাশে দাড়ি-ওয়ালাটা কে ? সুস্পষ্ট যাবনিক।

পুবন্দর

রোশেনাবাদের নবাব। ইরাণী বংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আর্য্য রক্ত বিশুদ্ধ।

তারক

আপনাকে কেমন দেখাচ্চে যে!

পুরন্দব

দেখাচ্চে তুর্কিব বাদশার মতো। নবাব সাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়াব মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তাবক

মেয়ের বিয়েতে ভাগবত পাঠ ছিল বুঝি?

পুবন্দব

ছিল পোলো খেলাব টুর্ণামেণ্ট। আমি ছিলুম নবাব সাহেবের আপন দলে।

তারক

কেমন সন্ন্যাসী আপনি?

পুরন্দর

ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর

বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্তভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ি, তোমার নাম ছিল বুকু, আজ শ্বশুরের সুপারিসে কক্‌স্‌হিল্‌ সাহেবের এটর্নি অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক নামের আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক

ডাক্তার উইল্‌কক্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাক্‌শন্‌ চিঠি পাওয়া যেতে পারবে ?

পুরন্দর

পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক

মাপ করবেন। (পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম)

বাঁশরী

সুষমার মাষ্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন ?

পুরন্দর

কেন দেব ? আরো একটী ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরী

সুরু করাবেন মুগ্ধবোধের পাঠ? মুগ্ধতার তলায় ডুবেছে যে-মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হোলে নাড়ী ছাড়বে।

পুরন্দর

(কিছুক্ষণ বাঁশরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা। (বাঁশরী মুখ ফিরিয়ে সরে গেল)

বিভাসিনী

সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

(সকলেব ঘবে প্রবেশ। দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে বাঁশবী থমকে দাঁড়াল।)

ক্ষিতীশ

তুমি যাবে না ঘরে?

বাঁশরী

সস্তা দরের সদুপদেশ শোনবার সখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ

সদুপদেশ!

বাঁশরী

এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালি-য়ানওয়ালাবাগেব মার।

ক্ষিতীশ

আমি একবার দেখে আসি গে।

বাঁশরী

না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্য-সম্রাট, গল্পটার মর্ম্ম যেখানে, সেখানে পৌঁছেছে তোমার দৃষ্টি ?

ক্ষিতীশ

আমার হয়েছে অন্ধ-গো-লাঙ্গুল ন্যায়। ল্যাজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেবেছে আমাকে কিন্তু চেহাবা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুবকে, পাবে রাজৈশ্বর্য্য, তাব বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরী

তবে শোনো বলি। সোমশঙ্কর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ

তাই না কি ? তাহোলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দাও। তারপরে সাঁৎরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক পারে পৌছব।

বাঁশরী

হয়তো জানো পুরন্দর তরুণ সমাজে বিনা মাইনেয় মাষ্টারি করেন। পরীক্ষায় উৎরিয়ে দিতে অদ্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে এতদিনে একটি মাত্র পেয়েছেন তার নাম শ্রীমতী সুষমা সেন।

ক্ষিতীশ

ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদেব কী দশা ?

বাঁশবী

আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাইনি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চঞ্চু মেলে চেয়ে আছে ঊর্দ্ধে।

ক্ষিতীশ

সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি ?

বাঁশরী

তোমার কী মনে হয় ?

ক্ষিতীশ

আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরী

ধন্য! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিষ্ট্। লোকে বলে নারী-স্বভাবের রহস্য ভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণচক্রবর্ত্তী, নমস্কার তোমাকে!

ক্ষিতীশ

(করজোড়ে) বন্দনা সারা হোলো এবার বর্ণনার পালা সুরু হোক।

বাঁশরী

এটা আন্দাজ করতে পারনি যে, সুষমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ পর্য্যন্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ

ভালোবাসা, না ভক্তি?

বাঁশরী

চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো মেয়েদের যে-ভালো-বাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহা-প্রয়াণ,—সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাট্ফর্মে নামে সেই গরীবের জন্য থার্ড্ক্লাস্, বড়ো জোর ইন্টার্মীডিয়েট্। সেলুন গাড়ী তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল

না, ওদের ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্য গগনে দুই হাত উর্দ্ধে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখোনি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভীড় !

ক্ষিতীশ

তা হবে। কিন্তু তার উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্ব্বরের প্রতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্য্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরী

তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা বোঝা গেল সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সুষমা। তার পরে ?

বাঁশরী

সে কী ভালোবাসা ! মরণের বাড়া ! সঙ্কোচ ছিল না কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে

যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাসে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হোলো মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঁশি, কী করি?" আমার বুদ্ধির উপব তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, "দাও না পুরন্দরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।" তিনি তো আঁৎকে উঠলেন, বললেন, "এমন কথা ভাবতেও পাব?" তখন নিজেই গেলুম পুরন্দরের কাছে। সোজা বললুম, "নিশ্চয়ই জানেন, সুষমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।" এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বললে, "সুষমা আমার ছাত্রী তার ভার আমাব পবে, আর আমার ভার তোমার পরে নয়।" পুরুষের কাছ থেকে এত বড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধাবণা ছিল সব পুরুষের পরেই সব মেয়েব আব্দার চলে, যদি নিঃসঙ্কোচ সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেই-খান থেকে কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কিনা।

বাঁশরী

দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো, সদর মহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে পর্য্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ

ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো বাঁশি। পুরন্দর আঙটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্য্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরণা।

বাঁশরী

সোমশঙ্করের মুখের দিকে দেখো, সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরন্দর, সে যেন ঐ সূর্য্যেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ

যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে॥

ক্ষিতীশ

সুষমার পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন?

বাঁশরী

ও যে আইডিয়ালিস্‌ট্! বাস্‌রে! এত বড়ো ভয়ঙ্কর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না ক্ষিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেঙ্গিস্ খাঁর চেয়ে সর্ব্বনেশে।

ক্ষিতীশ

সন্ন্যাসীর পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরী

যাকে তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরাণী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনী কাঞ্চন ছোঁয় না যে তা নয়, কিন্তু তাকে

দেয় ফেলে ওর কোন এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ

ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো?

বাঁশরী

সে আছে বাওয়ান্ন বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী পদ্মাবতীর ডুব সাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন ডাকঘর-বিবর্জ্জিত দেশে ও এক সঙ্ঘ বানিয়েছে, তরুণ তাপস সঙ্ঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্চে।

ক্ষিতীশ

কিন্তু তরুণী?

বাঁশরী

ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ

তা হোলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন?

বাঁশরী

অন্ন চাই যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়ীহাতাধারিণী তো বটে। রাজভাণ্ডারের চাবিটা

থাকবে ওরই হাতে। ঐযে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হোলো বুঝি।

(পুরন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে ।)

পুরন্দর

(সোমশঙ্কর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা, বৎসে যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম্ম করে স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।

(ডান হাতে সোমশঙ্করের ডান হাত ধরে)

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব,
জিত্বা শত্রূণ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।"

ওঠো তুমি যশোলাভ করো। শক্রদের জয় করো—যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

"নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্ তে
নমোস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব,
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ।"

তোমাকে নমস্কার সম্মুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব্বদিক থেকে। অনন্তবীর্য্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব্ব তুমিই সর্ব্ব!

[ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনি উঠে গেল। তখন রাত্রি, আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।]

সুষমা

এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

নন্দা

(গান)

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে ॥
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় র'বে তারি বাণী,
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে ॥

(পুরন্দরের প্রবেশ)

সুষমা

(ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভু, দুর্ব্বল আমি। মনের

গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও মুছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পুরন্দর

বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্য্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুষমা

আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হোলো। তোমারি পথ হোক আমার পথ।

পুরন্দর

তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুষমা

দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারি সঙ্গে।

পুরন্দর

আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে

ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারি দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশঙ্করের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ ?

সুষমা

পেরেছি।

পুরন্দর

সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্য্যকে সর্ব্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ রাখবে এই নারীর কাজ, মনে রেখো তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে এই কথাটি ভুলো না।

সুষমা

কখনো ভুলব না।

পুরন্দর

প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয় এই জন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করিতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাঁশরীদের বাড়ী। ক্ষিতীশ ও বাঁশরী।)

ক্ষিতীশ

তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মুহুর্মুহু বাজাতে লাগল গাড়ীর ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরী

ভোরবেলায়? অর্থাৎ?

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশরী

অকালবোধন!

ক্ষিতীশ

দুঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরী

বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নলিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক—ওরা তো ডেকোরেটেড্ ফূল্স্। কিন্তু সেই স্বগতোক্তিতে সঙ্কোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না! সেই চিত্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষদলের দিন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকাল বেলায় অন্তত ন-টা পর্য্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকাণ্ড। আপাতত এ বাড়ীটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জ্জন।

ক্ষিতীশ

ওয়েসিস্ দেখতে পাচ্চি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরী

ওগো পথিক, ওয়েসিস্ নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ

আমার মাথায় আরো উপমা আসছে বাঁশি, আজ

তোমার সকালবেলাকার অসজ্জিত রূপ দেখাচ্চে যেন সকাল বেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরী

দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা ঘরের বিজন বিরহের জন্য। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ডেকেছি, বাজে কথা ষ্ট্রীক্ট্‌লি প্রোহি-বিটেড্‌।

ক্ষিতীশ

এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্ম্মান্তিক জরুরী তোমার পক্ষে তা ঝেটিয়ে ফেলা বাজে।

বাঁশরী

আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিষ্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির

সঙ্কেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হোলো না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্চি আর্টিষ্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিষ্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তাহোলে অস্পষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিষ্ট। তুমি যেন হীরেমুক্তোর হরির লুঠ দিচ্চ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায় হাতে হাতে দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ

পুরুষ আর্টিষ্টকে এবার মেরেছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরী

এই সেই চিঠি। সন্ন্যাসী বলছেন,—প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্ব্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙীন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাৎলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখী ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারে যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌-টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ

শুনলেম চিঠি, তারপরে ?

বাঁশরী

তারপরে তোমার মাথা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হোলো দীক্ষা মন্ত্র।

ক্ষিতীশ

তাহোলে এর মধ্যে সোমশঙ্কর আসে কোথা থেকে?

বাঁশরী

প্রেমের সরকারী রাস্তায় যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখক-প্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলাহাওয়ায় সোমশঙ্করের পেট ভরবে কি?

ক্ষিতীশ

কী জানি। সূচনায় তো দেখতে পাচ্চি শূন্য পুরাণের পালা।

বাঁশরী

কিন্তু শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছু? শেষ মোকামে তো পৌঁছল গাড়ি, এ পর্য্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সন্ন্যাসী সারথি! আড্ডা বদলের সময় যখন

একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে ? সেই কথাটা বলো না রিয়লিস্ট্ !

ক্ষিতীশ

যাকে ওরা নাক সিট্‌কে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ করে মাটিতে ফেলে চট্‌কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়ে দেন ধূলো।

বাঁশরী

প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোঙরামিকে নয়। লেখো লেখো দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চম্‌কে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলার দুর্ব্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্য্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ

ইস্, তোমার মনটা নেমেছে ভলূক্যানোব জঠবাগ্নিব মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি, ওদের অবস্থায় পড়লে কী কবতে তুমি ?

বাঁশবী

সন্ন্যাসীব উপদেশ সোনাব জলে বাঁধানো খাতায় লিখে বাখতুম। তাব পবে প্রবৃত্তিব জোব কলমে তার প্রত্যেক অক্ষবেব উপব দিতুম কালীব আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু কবতেই চায় উল্টো মন্ত্রে, ওব মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায় আর একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ কবতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ

এখন কাজেব কথা পাড়া যাক। ইতিহাসেব গোড়াব দিকটায ফাঁক বয়েছে। ওদেব বিবাহ সম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটাল কী উপায়ে ?

বাঁশবী

প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তাব পদবীব উদ্ভব, ওবা যে কোনো এক খৃষ্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো এক দক্ষিণ প্রদেশ থেকে দিগ্‌বিজয়ী-বাহিনীব পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো এক বিশেষ

বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীব দ্রাবিড়ী পণ্ডিত কবলে তার সমর্থন। সন্ন্যাসী স্বয়ং গেল সোমশঙ্করদেব রাজ্যে, প্রজাবা হাঁ করে রইল ওব চেহাবা দেখে, কানাকানি কবতে লাগল কোনো একটা দেব অংশেব ঝালাই দিয়ে এব দেহখানা তৈবি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হোলো শৈবদর্শন ব্যাখ্যায়, বাজা-বাহাদুবেব মনটা সাদা, দেহটা জোবালো, তাতে লাগল কিছু সন্ন্যাসীর মন্ত্র, কিছু লাগল প্রকৃতিব মোহ, তাবপবে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ

হায়রে, সন্ন্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদেব হয়ে স্থূল প্রকৃতিব তবফে ঘটকালি কবেন না!

বাঁশরী

বাখো তোমাব ছিবলেমি। ভুল কবেছি তোমাকে নিয়ে, যে মানুষ খাঁটি লিখিযে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টি-কল্পনাব এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দব্ দব্ কবছে যাব নাড়ি, তাব মুখ দিযে কি বেবোয় খেলো কথা? কেমন কবে জাগাব তোমাকে? আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহাবচনার পূর্ব্ববাগ, শুনছি তাব অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না

অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ; থাক্‌গে, শেষ হোলো আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম।

(প্রস্থানোদ্যম)

ক্ষিতীশ

(ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে)

চাইনে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরী

(হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে)

তোমার বেমানান গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে ! আমি ভয়ঙ্কর সত্যি।

(ড্রেসিং গাউনপরা সতীশের প্রবেশ)

সতীশ

উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরী

উনি এতক্ষণ ষ্টেজের মুন্নুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ

ক্ষিতীশবাবুর নকল আসে না কি ?

বাঁশরী

আসে বৈ কী, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়।

তুমি এঁর কাছে একটু বোসো, আমি ওঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিইগে।

ক্ষিতীশ

দরকার নেই, কাজ আছে দেরি করতে পারব না।

[প্রস্থান।

বাঁশরী

মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা—তোমারি পদ্মাবতী।

(নেপথ্য হতে—"সময় হবে না"।)

বাঁশরী

হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগে।

সতীশ

আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরী

বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারি মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ

এমন ফেল-করা জিনিষ নিয়ে করবে কী।

বাঁশরী

ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ

তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ্ দেবার প্ল্যান্ আছে না কি?

বাঁশরী

দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ

ঘরের ছেলের প্রতিও। এদিকে ও-মহলের হাল খবরটা শুনেছ?

বাঁশরী

ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌঁছয় না। হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

সতীশ

কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হপ্তায়।

বাঁশরী

হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে?

সতীশ

ওদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ

দেখেছে তোমাকে রণরঙ্গিণী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়—এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরী

আমার তীর! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁইনে। বনমালী, মোটর ডাকো।

[বাঁশরীর প্রস্থান।

(শৈলর প্রবেশ, বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয় ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।)

সতীশ

কী আশ্চর্য্য! ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল

না, দেখিনি তো।

সতীশ

আঃ, বানিয়ে বলো না কেন? বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তাহোলে।

শৈল

তোমাদের ফরমাসে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে। আমরা যা, শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুসি হয় না কেন?

সতীশ

খুব হয়, এই যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসেব দরকার?

শৈল

আমি এসেছি বাঁশরীব কাছে।

সতীশ

ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সভ্য বিছানা থেকে উঠেই ছু-ছুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্ম্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে যদি বলতে আমারি জন্য এসেছ।

শৈল

ব্যারিষ্টার্ মানুষ, তুমি বড্ড লিটবল্। বাঁশরীর কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমাব কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন?

সতীশ

খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা

আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল

না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণ বাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস্ করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা তা বকে' যাই। পর্শুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায়নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তাহোলে একটা কাণ্ড বাধত। বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু সেই ছবি আমি ভুলতে পারিনে। বাঁশি গেল কোথায়?

(খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল।)

সতীশ

বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস্ গেছে।

শৈল

ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ

অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন? চা তৈরি স্থরু করো।

শৈল

খেয়ে এসেছি।

সতীশ

তা হোক না, আমি তো খাইনি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল

মিথ্যে আব্দার করো কেন?

সতীশ

সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী করলে, চায়ে আমি চিনি দিইনে তুমি জানো।

শৈল

ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ

আমি হোলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল

আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয়নি। ঝগড়া করছ কেন ?

সতীশ

কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স্ হয়ে উঠতে।

শৈল

আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হোলো ?

সতীশ

হোলেই যদি ওঠ তাহোলে হয়নি।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য

হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ

বলো ফুরসৎ নেই।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

শৈল

ও কী ও, কাজ কামাই করবে !

সতীশ

কবব, আমার খুসি।

শৈল

আমি যে দায়ী হব।

সতীশ

তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

(নেপথ্য থেকে—"সতীশদা!")

সতীশ

ঐরে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

(সুধাংশুব সঙ্গে একদল লোকেব প্রবেশ)

অলক্ষুণেব দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উননের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু

মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আজ ছাড়ছিনে!

সতীশ

ভয় দেখাও কেন ? চাও কী।

শচীন

চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ

কী! আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্ প্রোটেষ্ট্ জানাচ্চি, বলবান অস্বীকৃতি।

নবেন

দলিল দেখাও।

সতীশ

আমার দলিল, এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু

শৈলদেবী, এই বুঝি! বেআইনি প্রশ্রয় দেন পলাতককে।

শৈল

কিছু প্রশ্রয় দিইনে, নিন্ না আপনাদের দাবী আদায় করে।

সতীশ

শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়! আর

এদের সামনে সত্যের অপলাপ, প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল

কী প্রশ্রয় দিয়েছি?

সতীশ

এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বসোনি? শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন

লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তাহোলে ওকে আমাদের লাইফ্ মেম্বর্ করে নিই।

সতীশ

আচ্ছা তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার, তাহোলে এখনি বাকি বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন

শুধু চাঁদা নয়। আমাদেব ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরই—তারপরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে

যাই—আজ এসেছি বাঁশরী দেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ

সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুদ্ধ অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিস্ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা—ভাগো।

শৈল

আহা ও কী কথা! না খেয়ে যাবেন কেন? আমি বুঝি পারিনে খাওয়াতে। একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[শৈলের প্রস্থান।

সতীশ

কিন্তু ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছিনে।

সুধাংশু

কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ

কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন রচনা?

শচীন

ঠিক তাই।

সতীশ

আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা—

শচীন

না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

(শৈলের প্রবেশ)

শৈল

সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

—— ——

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বারান্দায় সোমশঙ্কর। গহনার বাক্স খুলে জহুরী গহনা দেখাচ্চে। কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।)

বাঁশরী

কিছু বলবার আছে।

(সোমশঙ্কর জহুরী ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে।)

সোমশঙ্কর

ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরী

ও সব কথা থাক্। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসিনি। তবু আর কিছু না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জান সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না ?

সোমশঙ্কর

জানি।

বাঁশরী

তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না ?

সোমশঙ্কর

কিছুই না।

বাঁশরী

তাহোলে সংসার-যাত্রাটা কী রকম হবে ?

সোমশঙ্কর

সংসার-যাত্রার কথা ভাবছিইনে।

বাঁশরী

তবে কিসের কথা ভাবছ ?

সোমশঙ্কর

একমাত্র সুষমার কথা।

বাঁশরী

অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশঙ্কর

না তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরী

কিসের দরকার আছে তার, টাকার ?

সোমশঙ্কব

তোমার যোগ্য কথা হোলো না বাঁশি !

বাঁশরী

আচ্ছা ভুল করেছি। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুষমার ?

সোমশঙ্কর

ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমতো সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরী

ওর ব্রত আগে, তারি পশ্চাতে তোমাব, পুরুষের মতো শোনাচ্চে না, একথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এত বড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা কবে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হোলো। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে কাজেব ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

(পুবন্দরের প্রবেশ। সোমশঙ্কর প্রণাম করলে, অগ্নিশিখার মতো বাঁশরী উঠে দাঁড়াল তার সামনে।)

বাঁশরী

আজ রাগ করবেন না ; ধৈর্য্য ধরবেন, কিছু প্রশ্ন করব।

(পুরন্দরের ইঙ্গিতে সোমশঙ্করের প্রস্থান ।)

পুরন্দর

আচ্ছা বলো তুমি।

বাঁশরী

জিজ্ঞাসা করি, সোমশঙ্করকে শ্রদ্ধা করেন আপনি ? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না ?

পুরন্দর

বিশেষ শ্রদ্ধা করি ।

বাঁশরী

তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না ?

পুরন্দর

জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশঙ্করই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরী

যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি ?

পুরন্দর

সুখকে উপেক্ষা করতে পাবে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরী

আপনি মানব-প্রকৃতিকে মানেন না ?

পুরন্দর

মানব-প্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরী

এতই যদি হোলো, ওরা বিয়ে নাই করত ?

পুরন্দর

ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে,—প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরী

(মোহ চাই,চাই সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের! তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে)—সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়া তাড়া দিতে বসেছ—বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ খাওয়াবার জন্য তৈরি হয়নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ঙ্কর তোমাদের মোহ!

পুবন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্ম্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরী

সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষেব মর্ম্ম-গ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে অসহ্য ব্যথাব 'পবে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ্, ব্যথা যাবে থেকে। তোমবা সব অমানুষ, মানুষেব বসতিতে এলে কী করতে! যাও না তোমাদেব গুহা গহ্বরে বদবিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদেব শুকিয়ে পাথব কবে ফেলো। আমবা সামান্য মানুষ, আমাদেব তৃষ্ণাব জল মুখেব থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়! ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

(সুষমাব প্রবেশ)

এই যে সুষমা, শোন্, বলি। মরীয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মবেছে অনেক,ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন

লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস্, জ্বলে জ্বলে। চাসনে তুই ভালোবাসা কিন্তু যে মেয়ে চায়, পাষাণ সে করেনি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চির-জীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস শিকার করিস সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস তবু তুই পুরুষ নোস—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

(সোমশঙ্করের প্রবেশ)

সোমশঙ্কর

বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরী

যাব না তো কী! মনে কোরো না মরব বুক ফেটে! জীবন হবে চির চিতানলের শ্মশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয়নি আমার! আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগ্‌লামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান। থামো সোমশঙ্কর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে

ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

[বাঁশরী ও সুষমার প্রস্থান।

পুরন্দর

সোমশঙ্কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশঙ্কর

বলুন।

পুবন্দব

যে ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণ ই তোমার আপন হয়েছে কি? তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণ ক্রিয়াব সঙ্গে?

সোমশঙ্কর

কেন সন্দেহ বোধ করছেন!

পুবন্দর

আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাকো তবে এখনি ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশঙ্কর

এমন কথা কেন বলছেন আজ? আমার মধ্যে দুর্ব্বলতার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি?

পুরন্দর

মোহিনী শক্তি আছে আমার এমন কথা কেউ কেউ বলে, শুনে লজ্জা পাই, যাদুকর নই আমি।

সোমশঙ্কর

আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে যাদুর ক্রিয়া।

পুরন্দর

ব্রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ, সে বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশঙ্কর

সন্ন্যাসী, যে ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকেব মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়?

পুবন্দর

এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করবে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারি কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশঙ্কর

এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো উর্দ্ধে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারি 'পরে ভার দিলে এই অনির্ব্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরন্দর

বৎস, যতদিন রক্ষা করবে, তার দ্বারা তুমি আপনা-কেই রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম রইল তোমার সঙ্গে,—ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতম্। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেই সঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে—হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্ব্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্ আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

[পুরন্দরের প্রস্থান।

(সোমশঙ্কর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।)

ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা।—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।

দুন্দুভিতে হোলো রে কার আঘাত সুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো ॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি,
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো ॥

(নেপথ্য থেকে)

যেতে পারি কি ?

সোমশঙ্কব

এসো এসো।

(তাবকেব প্রবেশ)

তাবক

বাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কী রকম ভয় ভয় কবে।

সোমশঙ্কর

কোনো কারণ তো দেখিনে।

তারক

কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্চে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য্য।

সোমশঙ্কর

বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক

সব বিয়ে তা নয় রাজন্। নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরযাত্রা হয়েছিল পটলডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয়নি। আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌর-পঞ্চাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চৌর-পঞ্চাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকী উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়? উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়-গহ্বরে বেড়াচ্চে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশঙ্কর

এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিক বন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক

আমাদের পাড়াব লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্ণরিতে ক্লাব্ করেছে। আপিস থেকে ফিবে এসে সেইখানে সন্ধ্যে-বেলায় বিষম হল্লা কবতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড্ করতে হবে।

সোমশঙ্কর

শুনেছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তাবক

সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পেরেচর্ কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশঙ্কর

বৈধ উপায়ে ওদের ঠাণ্ডা করতে রাজি আছি।

তারক

আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণ পত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশঙ্কর

পড়ে শোনাও।

তারক

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদর সেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানারসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের আশীষ লক্ষ লক্ষ,
তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ,
এর পরে আর মিল মেলে না যরলবহক্ষ।
ঐ আসছে ওদের দল।

(সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ।)

সোমশঙ্কর

কী উদ্দেশ্যে আগমন ?

সুধাংশু

গান শোনাব।

সোমশঙ্কর

তার পরে ?

সুধাংশু

তার পরে নোব্‌ল্‌ রিভেঞ্জ্‌, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশঙ্কর

ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী ? বোমা নয় ?

সুধাংশু

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশঙ্কর

কার রচনা ?

শচীন

কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপিরাইট্‌-স্বত্ব আমাদেরই, বাক্যগুলি যার তাকে আমরা গণ্য করিনে।

গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল,

মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল ॥
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল ॥
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি',
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল ॥
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল ॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে,—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল ॥
আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল ॥

সোমশঙ্কর

এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু

আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশঙ্কর

তৎপূর্ব্বে—

সুধাংশু

তৎপূর্ব্বে সুমহতী প্রতিহিংসা।

(গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরোল।)

লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরি। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশঙ্কর

কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানিনে।

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

(বাঁশরীদেব বাড়ী। সতীশ ডেস্কে বসে লিখছে—সুষমার ছোটো বোন সুষীমার প্রবেশ।)

সতীশ

আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা কবতে এসেছিস? বরের মুখ-দেখা বুঝি আজ?

সুষীমা

যাও!

সতীশ

যাও কী! বেশিদিনেব কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা কবিস আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলুম সেটা ভেঙে ব্রোচ্ তৈরি হয়েছে।

সুষীমা

সতীশদা, কী বকছ তুমি?

সতীশ

আচ্ছা থাক্ তবে, কী জন্যে এসেছিস ?

সুষীমা

দিদির বিয়েতে প্রেজেন্ট্ দেব।

সতীশ

সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস ?

সুষীমা

এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ

ভালো জিনিষ, আমারি লোভ হচ্চে।

সুষীমা

আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ

ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে ?

সুষীমা

না, লুকিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থলির উপরে বাঁশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ

বাঁশিদিদি আঁকতে পাবে কে বললে তোকে ?

সুষীমা

শঙ্করদাদা। তার কাছে একটা সিগারেট্ কেস্ আছে সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে এক-জোড়া পায়রা এঁকেছেন নিজের হাতে। চমৎকার।

সতীশ

আচ্ছা তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

(বাঁশরীর প্রবেশ)

বাঁশরী

কী সুষী!

সুষীমা

তোমাকে সতীশদাদা সব বলেছেন?

বাঁশরী

হাঁ বলেছেন। ছবি এঁকে দেব তোর থলির উপর? কী ছবি আঁকব?

সুষীমা

এক জোড়া পায়রা, ঠিক যেমন এঁকেছ শঙ্করদাদার সিগারেট্ কেসের উপরে।

বাঁশরী

ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিসনে যে আমি এঁকে দিয়েছি।

সুষীমা

কাউকে না।

বাঁশরী

তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।

সুষীমা

বলো কী করতে হবে।

বাঁশরী

সেই সিগারেট্ কেস্‌টা আমাকে এনে দিতে হবে।

সুষীমা

তাঁর বুকের পকেটে থাকে। কক্ষনো আমাকে দেবেন না।

বাঁশরী

আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।

সুষীমা

তুমি তাঁকে দিয়েছ আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে?

বাঁশরী

তোমার শঙ্করদাদাও দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে নেন।

সুষীমা

কক্ষনো না।

বাঁশবী

আচ্ছা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমাব নাম করে।

সুষীমা

আচ্ছা করব। আমি যাই, কিন্তু ভুলো না আমাব কথা।

বাঁশবী

তুইও ভুলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা একবাক্স চকোলেট্, কাউকে বলিসনে আমি দিয়েছি।

সুষীমা

কেন ?

বাঁশবী

মা জানতে পাবলে রাগ কববেন।

সুষীমা

কেন ?

বাঁশরী

যদি তোর অসুখ কবে।

সুষীমা

বলব না, কিন্তু খেতে দেব শঙ্করদাদাকেও।

[সুষীমার প্রস্থান।

[একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরী সোফায় হেলান দিয়ে বসল।]

(লীলার প্রবেশ)

বাঁশরী

দেখ্ লীলা, মুখ গম্ভীব করে আসিসনে ভাই, তাহোলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্চে সান্ত্বনা দেবার কুমৎলব আছে, বাদল নামল বলে। দুঃখ আমার সয়, সান্ত্বনা আমার সয় না, সে তোদের জানা। বসে-ছিলেম গ্রামোফোনে কমিক্ গান বাজাতে কিন্তু তার চেয়ে কমিক্ জিনিষ নিয়ে পড়েছি।

লীলা

কী বলো তো বাঁশি।

বাঁশরী

ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

লীলা

(খাতাটা তুলে নিয়ে) "ভালোবাসার নীলাম"— নামটা চলবে বাজারে।

বাঁশরী

বস্তুটাও। এ জিনিষের কাট্‌তি আছে। পড়তে চাস ?

লীলা

না ভাই সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরী

আমি কি সাজাতে পারতুম না!

লীলা

আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস?

বাঁশরী

ডাকতে সাহস হোলো না! ভীরু ওরা।

লীলা

তা নয়, লজ্জা হোলো, কী বলে তোকে ডাকবে?

বাঁশরী

না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথা-প্রসঙ্গে বলিস, "বাঁশী বিছানায় শুয়ে কমিক্ গল্প পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।" নিশ্চয় বলিস।

লীলা

নিশ্চয় বলব, গল্পের বিষয়টা কী বল্ দেখি?

বাঁশরী

হিরোর নাম স্যার্ চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠে পড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেন্ট্-এন্টনির টেম্-টেশন্—ছবি দেখেছিস তো ? দিনের পর দিন নূতন বেহায়াগিরি—তোর খুব যে শুচিবাই তা নয়, তবু ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ঘাটে দৌড় মারতে চাইতিস। দ্বিতীয় নম্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষমাসের অৰ্দ্ধরাতে খিড়্কির ঘাটে —তুই ভাবছিস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল—ক্ষিতীশের কল্পনাকে অবিচার করিসনে ; নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঁঠে পর্য্যন্ত নেবেছিল। ঠাণ্ডা জলে ছ্যাঁক্ করে উঠল গা-টা। ছুটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এই খানটাতে সাইকলজির তর্ক এই, শীত করল বলেই মরা মুলতুবি কিম্বা শীত করাতে আগুনের কথাটা মাথায় এল, অমনি ভাবল ওদের জ্বালিয়ে মারবে বেঁচে থেকে।

লীলা

কিছুতে বুঝতে পারিনে এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেখেছিস কী করে ?

বাঁশরী

অবিচার করিসনে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হোতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বুঝি আসছে।

লীলা

আমি তবে চললুম।

বাঁশরী

একেবারে যাসনে। সন্ধ্যেবেলাটা কোনও মতে কাটাতে হবে। কমিক্ গল্পটাতো শেষ হোলো।

লীলা

কমিক্ গল্পের একটিনি করতে হবে বুঝি আমাকেই, আচ্ছা রইলুম পাশের ঘরে।

(ক্ষিতীশের প্রবেশ)

ক্ষিতীশ

কেমন লাগল? মেলোড্রামার খাদ মেশাইনি শিকি তোলাও। সেন্টিমেণ্টালিটির তরল রস চায় যে-

সব খুকীরা, তাদের পক্ষে নির্জ্জলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।

বাঁশরী

কেমন লাগল বুঝিয়ে দিচ্চি (পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ

করলে কী! সর্ব্বনাশ! এটা আমার সব লেখার সেরা, নষ্ট করে ফেললে?

বাঁশরী

দলিলটা নষ্ট করে ফেললেই সেরা জিনিষের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ

সাহিত্যে নিজে কিছু দেবার শক্তি নেই, অথচ সঙ্কোচ নেই তাকে বঞ্চিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছুতে ছাড়ব না।

বাঁশরী

কী দাম চাই?

ক্ষিতীশ

তোমাকে!

বাঁশরী

ক্ষতি পূরণ এত সস্তায়, সাহস আছে নিতে ?

ক্ষিতীশ

আছে।

বাঁশরী

সেন্টিমেণ্ট্ এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ

আশাও করিনে।

বাঁশরী

নির্জ্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য !

ক্ষিতীশ

রাজি আছি।

বাঁশরী

আছ রাজি ? বুঝে সুঝে বলছ ? এ কমিক্ নভেল্ নয়, ভুল করলে প্রুফ্ দেখা চলবে না, এডিশন্ও ফুরবে না মরার দিন পর্য্যন্ত।

ক্ষিতীশ

শিশু নই, একথা বুঝি।

বাঁশরী

না মশায়, কিচ্ছু বোঝ না, বুঝতে হবে দিনে

দিনে পলে পলে, বুঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়।

ক্ষিতীশ

সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরী

তবে বলি শোনো। অবোধের 'পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। তোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অবুঝের মতো নিজের সর্ব্বনাশের যে প্রস্তাবটা করলে তাতে সম্মতি দিতে দয়া হচ্চে।

ক্ষিতীশ

সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নির্দ্দয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরী

মেলোড্রামা ?

ক্ষিতীশ

না মেলোড্রামা নয়।

বাঁশরী

ক্রমে মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না ?

ক্ষিতীশ

যদি হয় তবে সেই দিনগুলোকে ঐ খাতার পাতার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো।

বাঁশরী

(উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা সম্মতি দিলেম। (ক্ষিতীশ ছুটে এল বাঁশরীর দিকে) ঐরে স্বরু হোলো। ভালো করে ভেবে দেখো, এখনও পিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ

(করজোড়ে) মাপ ক'রো, ভয় হচ্চে পাছে মত বদলায়।

বাঁশরী

যখন বদলাবে তখন ভয় কোরো। অমন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজেষ্ট্রি আফিসে। তিন চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ

নোটিশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে।

বাঁশরী

তাহোলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ

অনুষ্ঠান ?

বাঁশরী

হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কমিকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনো বুঝলে না জিনিষটা সীরিয়াস্।

ক্ষিতীশ

কাউকে নিমন্ত্রণ ?

বাঁশরী

কাউকে না।

ক্ষিতীশ

কাউকেই না ?

বাঁশরী

আচ্ছা সোমশঙ্করকে।

ক্ষিতীশ

কী রকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া—

বাঁশরী

খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ

স্বহস্তে ?

বাঁশরী

হাঁ স্বহস্তেই।

ক্ষিতীশ

আজই ?

বাঁশরী

হাঁ এখনই। (চিঠি লিখে) এই নাও পড়ো।

(ক্ষিতীশের পাঠ)

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরী সরকারের সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ভৌমিকের অবিলম্বে বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশ্যক—আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরী

এ চিঠি এখনি রাজার দ্বারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান।

লীলা, শুনে যা খবরটা।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা

কী খবর ?

বাঁশরী

বাঁশরী সরকারের সঙ্গে ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

লীলা

আঃ কী বলিস্ তার ঠিকানা নেই।

বাঁশরী

এতদিন পরে একটা ঠিকানা হোলো।

লীলা

এটা যে আত্মহত্যা।

বাঁশরী

তারপরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।

লীলা

সব চেয়ে দুঃখ এই যে যেটা ট্র্যাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন।

বাঁশরী

ট্র্যাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রু-পাতের চেয়ে অগৌরব নেই।

লীলা

আমাদের রাশীচক্র থেকে খসে পড়ল সব চেয়ে উজ্জ্বল তারাটি। যদি তার জ্বালা নিভত শোক করতুম

না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।

বাঁশরী

তা হোক, ডার্ক্‌ হীট্‌, কালো আগুন, কারো চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিস নে, যে আমার সাথী হোতে চলল শোচনীয় সেই। এ কী! শঙ্কর আসছে। তুই যা ভাই একটু আড়ালে।

[লীলার প্রস্থান।

(সোমশঙ্করের প্রবেশ)

সোমশঙ্কর

বাঁশি।

বাঁশরী

তুমি যে!

সোমশঙ্কর

নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্যপক্ষ থেকে ডাকেনি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সঙ্কোচ নেই।

বাঁশরী

কেন সঙ্কোচ নেই? ঔদাসীন্য?

সোমশঙ্কর

তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরী

তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন?

সোমশঙ্কর

সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরী

তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশঙ্কর

কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সঙ্কল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো এক সঙ্কটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরী

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশঙ্কর

নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি।

তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্ব্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে দুর্গম পথে সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরী

সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্য্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে? একদিন যে শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলে আজ কিছু কি তার অবশিষ্ট নেই? ভয় করবে না?

সোমশঙ্কর

শক্তি একটুও কমেনি, তবু ভয় করব না।

বাঁশরী

যদি তেমন করে পিছু ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে?

সোমশঙ্কর

কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশবী

তবে ?

সোমশঙ্কব

তোমাকে বিশ্বাস কবি। আমাব সত্য কখনই ভাঙা পডবে না তোমাব হাতে। সঙ্কটেব মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় কবতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্য ভঙ্গ হোলে আমি প্রাণ বাখব না। মবব তুষানলে পুড়ে।

বাঁশবী

শঙ্কব, তুমি ক্ষত্রিয়েব মতোই ভালোবাসতে পারো। শুধু ভাব দিয়ে নয় বীর্য্য দিয়ে। সত্যি কবে বলো আজও কি আমাকে সেদিনেব মতোই ততখানিই ভালোবাসো।

সোমশঙ্কব

ততখানিই।

বাঁশবী

আব কিছুই চাইনে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমাব ব্রত, তাকে ঈর্ষা কবব না।

সোমশঙ্কব

একটা কথা বাকি আছে।

বাঁশরী

কী বলো।

সোমশঙ্কর

আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্চি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলঙ্কারের সেই থলি বের করলে।)

বাঁশরী

ও কী, ওসব যে তলিয়ে ছিল জলে।

সোমশঙ্কর

ডুব দিয়ে আবার তুলে এনেছি।

বাঁশরী

মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে।

(সোমশঙ্কর গয়না পরিয়ে দিলে।)

শঙ্কু আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কান্না।)

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য

রাজাবাহাদুরের চিঠি।

বাঁশরী

(দাঁড়িয়ে উঠে) শঙ্কর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশঙ্কর

না পড়েই ?

বাঁশরী

হাঁ, না পড়েই।

সোমশঙ্কর

তবে নাও।

(বাঁশরী চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল)

এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট্‌ কেস্‌ চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন, বুঝতে পারিনি।

বাঁশরী

আর একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীয়বারকার দান।

সোমশঙ্কর

সন্ন্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনি— বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে।

বাঁশরী

যাও, জয় হোক সন্ন্যাসীর।

[সোমশঙ্করের প্রস্থান।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা

কী ভাই—

বাঁশরী

একটু বোসো। আর একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরি হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

চিঠি

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু—

তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারো বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। "ভালোবাসার নীলামে" সর্ব্বোচ্চ দরই পেয়েছি, তোমার ডাক সে পর্য্যন্ত পৌঁছত না। অন্যত্র অন্য কোনো সান্ত্বনার সুযোগ উপস্থিত মতো যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশা করি এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরীর

প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যায় এক পৈঁঠে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা

(বাঁশরীকে জড়িয়ে ধরে) আঃ বাঁচালি ভাই, আমাদের সবাইকে। সুষমার উপর এখন আর তোর রাগ নেই ?

বাঁশরী

কেন থাকবে ? সে কি আমার চেয়ে জিতেছে ? লীলা, দে ভাই সব দরজা খুলে সব আলোগুলো জ্বালিয়ে—বাগান থেকে যতগুলো ফুল পাস্ নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

[লীলার প্রস্থান ।

(পুরন্দরের প্রবেশ)

বাঁশরী

এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে ?

পুরন্দর

চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বাঁশরী

যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল ?

পুবন্দর

তোমার কথা কখনোই ভুলিনি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিত্যই একথা মনে রেখেছি তোমাকে চাই আমাদের কাজে—দুর্লভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।

বাঁশবী

পাবো নি দুঃখ দিতে। মবা কঠিন নয় পেযেছি তাব প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষ কথা বলব সন্ন্যাসী, শোনো। সুষমাকে তুমি ভালোবাসো, সুষমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতেব হার পবেছে সে গলায়, তাব আব ভাবনা কিসের। সত্য কিনা বলো।

পুবন্দর

সত্য কি মিথ্যা সে কথা বলে কোনও ফল নেই, দুইই সমান।

বাঁশরী

সুষমার ভাগ্য ভালো কিন্তু সোমশঙ্করকে কী তুমি দিলে?

পুবন্দর

সে পুরুষ, সে ক্ষত্রিয়, সে তপস্বী।

বাঁশরী

হোক পুরুষ, হোক ক্ষত্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

পুরন্দর

বঞ্চিত হবার দুঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরী

কখনই না, তাতেই পঙ্গু করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ সংসারে।

পুরন্দর

জানি।

বাঁশরী

সে সুষমা নয়।

পুরন্দর

তাও জানি। কিন্তু ঐ জীবের শক্তি হরণ করতে পারে এমনও একটী মাত্র মেয়ে আছে এ সংসারে।

বাঁশরী

আজ অভয় দিচ্চে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না।

পুরন্দর

তবে আজ যাবার দিনে নিঃসঙ্কোচে তারি হাতে রেখে গেলেম সোমশঙ্করের দুর্গম পথের পাথেয়।

বাঁশরী

এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পায়ে।

পুরন্দর

আর আমি দিয়ে গেলেম, তোমাকে একটি গান তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

গান

পিণাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জর তলে কম্পন জাগে শঙ্কার॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী
সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি',
বজ্রভীষণ গর্জ্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি',
সুর-পরিষদ বন্দী,
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খল ঝংকার॥
দানব-দম্ভ তর্জ্জি'
রুদ্র উঠিল গর্জ্জি',
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধূলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার॥